দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 18 OCT. 1998 ...
পৃষ্ঠা: ৩ কলাম ... ৭ ...

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞান কোর্স॥ ভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ

মাসুদ কামাল

স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি এবং পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে বেসরকারী ডাক্তাররা ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উত্থাপিত হয়েছে স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহে পাস করার ক্ষেত্রে উন্নত দেশের মতো নির্দিষ্ট সংখ্যক টার্ম বা চান্স উঠিয়ে দেয়ার। পরীক্ষা পাসের ক্ষেত্রে সীমাহীন সুযোগ প্রদানের এ দাবিটি সাম্প্রতিককালে জোরালো হয়ে দেখা দিয়েছে। এমডি, এমএস, এমফিল এবং ডিপ্লোমা কোর্সের সিংহভাগ ছাত্র এ দাবির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ। দাবির যৌক্তিকতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অনুষদের একাধিক শিক্ষক পর্যন্ত স্বীকার করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সহযোগী অধ্যাপক বলেন, এ ব্যাপারে সবচেয়ে কঠিন ছিল এমআরসিপি (ইউকে)-এর পরীক্ষা পদ্ধতি। সেখানেও চলতি বছর থেকে যতবার ইচ্ছা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এরপর আমাদের প্রাচীনপন্থীদের উদার হওয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ঐসব কোর্সে বর্তমানে পাস করার জন্য ৫ বার চান্স দেয়া হয়। ফলে তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করেও যদি কেউ কোন কারণে ফেল করে তাহলে ব্যর্থ হয়ে যায় তার এ সময়কালের সাধনা। উন্নত বিশ্বসহ আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহে পর্যন্ত নিয়ম হচ্ছে—নির্দিষ্ট সময় লেখাপড়া শেষে একজন চিকিৎসক স্নাতকোত্তর এসব ডিগ্রীর জন্য যতবার খুশি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। কেবল নির্দিষ্ট সময়ে ফরম ফিলআপ করে পরীক্ষায় বসলেই হবে। এমনকি আমাদের দেশেও এফসিপিএস পরীক্ষাতেও প্রচলিত আছে এই নিয়ম। এমএস, এমডি, এমফিল বা ডিপ্লোমাতে সীমাহীন পরীক্ষার সুযোগের দাবি এখন সিংহভাগ ছাত্রছাত্রীসহ তরুণ শিক্ষকদের মধ্যেও উচ্চারিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের চার শ'র মতো স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় আড়াই শ' এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীনকে তাঁদের দাবির বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছেন। বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে অনুষদের সভায় এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশিত সীমাহীন চান্সের বিষয়টি অনুমোদন পায়নি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন কোর্সের ভুক্তভোগী একাধিক ছাত্রছাত্রী তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে।

এক ছাত্র স্পষ্ট করেই বলে, এসব কোর্সে ফেলের ক্ষেত্রে অনেক সময় শিক্ষকদের পছন্দ-অপছন্দও বিরাট ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়। ফলে নির্দিষ্টসংখ্যক চান্সে পাস করার বাধ্যবাধকতা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের ওপর বিরাট মানসিক চাপ হিসাবে দেখা দেয়। কারণ ভয় থাকে, পাস করতে না পারলে পূর্ববর্তী বছরগুলোর শ্রম তার বৃথা যাবে।

এসবের পাশাপাশি স্নাতকোত্তর কোর্সে সরকারী ও বেসরকারী ডাক্তারদের মধ্যে চলমান বৈষম্যের বিষয়টিও ইদানীং বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। স্নাতকোত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই কোর্সগুলোর সিংহভাগ সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয় বলেই বোধকরি ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারী ডাক্তাররা সুযোগ পান বেশি। একাধিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ভর্তির সুযোগ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৭৫ শতাংশই সরকারী ডাক্তার। এরা ডেপুটেশনে এবং সরকারী খরচে পড়তে আসেন ঢাকাতে। ফলে লেখাপড়া কিংবা পরীক্ষায় অংশ নেয়ার চেয়ে এঁদের নজর বেশি থাকে ঢাকায় অবস্থানটিকে কিভাবে স্থায়ী করা যায় সেদিকে।

এসব সমস্যা নিরসনে অভিজ্ঞ মহল থেকে দাবি উঠেছে মেধার ভিত্তিতে প্রকৃত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি পদ্ধতি চালুর। আর কোটা যদি থাকতেই হয়—তবে তা থাকা উচিত বেসরকারী এবং তরুণ চিকিৎসকদের জন্য। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহে পাঠরত বেসরকারী চিকিৎসকদের অধিকাংশই তরুণ এবং প্রতিভাবান। দেশে বেসরকারী পর্যায়ে আরও বেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির লক্ষ্যেই এ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ জরুরী বলে মত প্রকাশ করেছে বিশেষজ্ঞ মহল।

দেশে প্রথমবারের মতো একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর অন্তত সেখানে ওপরে উল্লিখিত সমস্যাগুলো থাকবে না আশা করেছিল বিভিন্ন মহল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ও পরীক্ষা পদ্ধতি এখনও সেই গতানুগতিক ধারাতেই চলছে। ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারী অলিখিত কোটা পদ্ধতি চালু রয়েছে এখনও। এমনকি ভর্তির ক্ষেত্রে ওয়েটিং লিস্ট পর্যন্ত সরকারী-বেসরকারী প্রার্থীদের টাঙ্গানো হয়েছে আলাদা করে। এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এমএ কাদেরীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "একাডেমিক কাউন্সিল এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এখনও এক বছরও হয়নি। প্রত্যাশিত অনেক পরিবর্তনই এখনও সম্ভব হয়নি। তবে সময়মতো ভেবেচিন্তে অনেক কিছুই করা হবে।"